ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 09. Number 01. July 2013

সুলতানী বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ও সময়ক্রম এবং সুলতানদের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী : একটি পর্যালোচনা

ড. সালমা সুলতানা*

Abstract : On review of the history of "Sultani Bengal" has been found that the contribution of Sultans in the Political, Social and Religious fields is undoubtedly priasworthy. During this period Bengal had been ruled sometimes by the independent Sultans and sometimes by the representatives sent by the Delhi government. So, for the rise and fall of various dynasties the geographical boundary of Bengal had naturally been changed or enlarged and the political, religious, social and cultural activities of the Sultans have enriched the history of Bengal. The present article deals with the geographical boundaries and chronological segnemee The Sultans of Bengal, along with relevant incidents

শাসনকাল এবং শাসনকার্যের ধারাবাহিকতায় বাংলার সুলতানদের সময়ক্রমকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- ১. ইখতিয়ারউদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হাজী ইলিয়াস অর্থাৎ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রারম্ভিক সময়। এসময় বাংলার শাসকগণ দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং অর্ধ-স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ২. ফখরউদ্‌দীন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে অর্থাৎ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শের শাহের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানী আমল। এসময় বাংলার শাসকগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এসব বংশের মধ্যে ইলিয়াস শাহী বংশ, রাজা গণেশের বংশ, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী বংশ, হাবশী বংশ এবং হুসাইন শাহী বংশ উল্লেখ্য। এসময় সুলতানগণ নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেছেন এবং খলিফা ও খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক বাক্য উপস্থাপন করেছেন। আবার কখনও কখনও স্বয়ং খলিফা উপাধি ধারণ করে নিজেদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়তাকারীরূপে উপস্থাপন করেছেন। ৩. ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত শুর ও কররানী আমল। এসময় পর্বে সুলতানগণ মুদ্রা প্রবর্তন করে স্বাধীনতার প্রমাণ রেখেছেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১. প্রারম্ভিক কাল: এই সময়কে 'প্রাক-স্বাধীন সুলতানী আমল' নামেও অভিহিত করা যায়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন এবং তাঁর রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১] নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী ও দেবকোট। এছাড়া প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে তিনি অধিকৃত অঞ্চলকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে 'ইকতায়' বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ইকতায় একজন মুকতা (ইকতার শাসনকর্তার নাম) নিযুক্ত করেন।[২] এসব ইকতার মধ্যে নারকুটি (বর্তমান নাটোরের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়), বারসুলী, গঙ্গাতরী, মাসিদা সন্তষ প্রভৃতি বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়।[৩] উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার ক্ষমতা লাভ করে দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুহাম্মদ ঘোরীর নামে খুৎবা পাঠ ও স্মারক মুদ্রা মুদ্রিত করেন। দূর্ভাগ্যবশত তাঁর শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম তিন সহচর শিরাণ খলজী, আলী মর্দান খলজী এবং হুসামউদ্‌দীন ইওয়ায খলজী ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। এসময়ের ইতিহাস ছিল খলজী মালিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ইতিহাস। এই অন্তর্বিরোধের সুযোগে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশ বাংলাকে তাঁর অধীন প্রদেশে পরিণত করেন।

ইখতিয়ারউদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর শিরাণ খলজী লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমতা লাভ করেই বখতিয়ার খলজীর হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত আলী মর্দান খলজীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলী মর্দানের ইকতা বরসৌল আক্রমণ করেন এবং আলী মর্দানকে বন্দী করে ইস্পাহানী নামক একজন কোতয়ালের অধীনে রাখেন।[৪] তিনি দিল্লীর প্রতি প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীন শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৫] মুহাম্মদ শিরাণ খলজী দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও আলী মর্দান খলজী হঠাৎ পলায়ন করে লখনৌতির শান্তি ভঙ্গ করেন এবং কুতবউদ্‌দীনের শরনাপন্ন হয়ে তাকে লখনৌতি আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। ফলে অন্তর্বিরোধ নিরসনের জন্য কুতবউদ্‌দীন কর্তৃক প্রেরিত অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমীর সাথে এক সংঘর্ষে শিরাণ খলজী পরাজিত হন ও পলায়ন করেন। এই পলায়নের মধ্য দিয়ে তাঁর এক বছর (১২০৭-০৮ খ্রী.) ব্যাপী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিরাণ খলজীর পর বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আলী মর্দান খলজী (১২১০-১২১২ খ্রী.)। প্রামাণ্য সূত্রের অভাবে তাঁর রাজ্যের সীমানা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সহজ্জসাধ্য না হলেও মনে করা হয় যে, সোন নদীর পূর্ব পর্যন্ত বিহার তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬] তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্‌দীনের মৃত্যুর ফলে দিল্লীতে

কুতবউদ্‌দীনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এবং এই সুযোগে আলী মর্দান খলজীর "আলাউদ্‌দীন" উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা।[৭] ইতোপূর্বে বখতিয়ার খলজী এবং শিরাণ খলজী অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করলেও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার কোন প্রমাণ নেই। সেই সূত্রে আলী মর্দান খলজীকে বাংলার প্রথম 'স্বাধীন সুলতান' বলা যায়।[৮] তবে তিনি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হন। কারণ ক্ষমতার দম্ভে সুলতান আলী মর্দান দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং যথেচ্ছাচার আচরণ করেন। এতে খলজী আমীরেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হুসাম-উদ-দীন ইওয়ায খলজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে গোপনে সুলতান আলাউদ্‌দীন আলী মর্দানকে হত্যা করে হুসামউদ্‌দীন ইওয়ায খলজী 'সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন ইওয়ায খলজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত[৯] হন এবং কৃতিত্বের সাথে পনের বছর বাংলা শাসন করেন। লখনৌতির খলজী মালিকদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষমতা লাভ করে মুসলিম রাজ্যকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে তিনি দেবকোট থেকে রাজধানী আবার লখনৌতিতে স্থানান্তরীত করেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুদৃঢ় কল্পে বসকোট নামে একটি দূর্গ তৈরী করেন।[১০] মুসলিম বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন এবং বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।[১১] স্বীয় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য যেমন, কামরূপ, উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ এবং ত্রিহুতের রাজাদের কর দিতে বাধ্য করেন।[১২] তার রাজ্যসীমা ছিল লখনৌতি (মালদহ অঞ্চলের অংশ), পূর্ণিয়া (কুশী নদীর পূর্ব দিকস্থ পূর্ণিয়া অঞ্চলের কতকাংশ), তাজপুর, পিঁজরা (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (কুচবিহারের দক্ষিণে তিস্তা থেকে ব্রক্ষ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগ, বর্তমান রংপুর অঞ্চল), বরবকাবাদ (লখনৌতির দক্ষিণে বর্তমান রাজশাহী অঞ্চল), বাজুহা সরকারের পশ্চিমাংশ (বর্তমান রাজশাহীর কিয়দংশ এবং বগুড়া অঞ্চল), তান্‌ডা (সিকরিগলি থেকে রাজমহল সাতগাঁও পরগণার কিয়দংশ এবং মুর্শিদাবাদের কতকাংশ), শরিফাবাদ (বীরভূম অঞ্চল), সুলেমানাবাদ তাঁর স্বয়ং বিজিত রাজ্য।[১৩] তিনি দক্ষিণ বিহারও পুনরাধিকার করেন এবং উত্তর বিহারে গণ্ডক নদী এবং দিল্লীর অধীন অযোধ্যা প্রদেশ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন।[১৪]

বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওয়ায খলজীই সর্বপ্রথম রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করে মুদ্রা মুদ্রিত করেন। কোন কোন মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফারও নাম উৎকীর্ণ করেন। আব্বাসীয় খলিফার নামোল্লেখ থেকে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, দিল্লীর সুলতানের সমকক্ষতা দাবী করার জন্য তিনি আব্বাসীয় খলিফার নিকট থেকে সনদ লাভ করেন।[১৫] তাঁর এই স্বাধীনতা স্পৃহার জন্য দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে এবং ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। ফলশ্রুতিতে বাংলা দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[১৬]

১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান বলবনের মুত্যু পর্যন্ত প্রায় ৬০ বছর লখনৌতি দিল্লীর অধীন প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এসময় ১৫ জন শাসকের বাংলা

শাসনের কথা জানতে পারা যায়। এসব শাসনকর্তার অনেকেই বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও দিল্লীর সুলতানগণের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তা স্থায়ীত্ব লাভ করেনি।[১৭]

১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে খলজী আমীর গিয়াসউদ্‌দীন ইওয়ায খলজীকে হত্যার পর ইলতুৎমিশ বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন এবং পুত্র নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদকে (১২২৭-২৯ খ্রী.) লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দূর্ভাগ্যবশত নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ মাত্র দেড় বছর শাসন করার পর ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে লখনৌতিতে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইখতিয়ারউদ্‌দীন বল্‌কা খলজী (১২২৯-৩০ খ্রী.) বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ তাকে দমন করে খলজীদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেন। এরপর তিনি মালিক আলাউদ্‌দীন জানীকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন (১২৩০-৩২ খ্রী.)।[১৮] তিনি এক বছরের কিছু বেশী সময় লখনৌতির শাসনকর্তারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৯] এসময়ের বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু অবগত হওয়া যায় না। যেকোন কারণেই হোক না কেন ইলতুৎমিশ তাঁকে পদচ্যুত করে তদস্থলে মালিক সাইফুদ্‌দীন আইবককে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তিনি প্রায় তিন বছরকাল (১২৩২-৩৬ খ্রী.) লখনৌতি শাসন করেন।[২০] তাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আওর খান নামক একজন তুর্কী লখনৌতির শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। কিন্তু বিহারের শাসনকর্তা তুঘরল তুঘান খান লখনৌতির অধিকার দাবী করলে উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে আওর খান পরাজিত ও নিহত হন। অপর দিকে বিজয়ী তুঘরল তুঘান খান বাংলা ও বিহারের শাসনভার গ্রহণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় নয় বছর লখনৌতি শাসন করেন।[২১] তাঁর পরে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন কমরউদ্‌দীন তমর খান কিরাণ। তিনি প্রায় দু'বছর (১২৪৫-৪৭ খ্রী.) লখনৌতি শাসন করেন। তাঁর দুর্বল শাসনামলে কোন রাজ্য জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরপর মালিক আলাউদ্‌দীন জানীর পুত্র মালিক জালালউদ্‌দীন মসউদ জানী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রায় চার বছর (১২৪৭-১২৫১ খ্রী.) বাংলা শাসন করেন[২২] এবং নিজেকে "মালিক-উশ-শরক (পূর্ব অঞ্চলের অধিপতি)" এবং "শাহ" উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৩] কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা তাঁকে এরূপ উপাধি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে করা যায়।

জালালউদ্‌দীন মসউদ জানীর পর অযোধ্যার গভর্নর মালিক ইখতিয়ারউদ্‌দীন ইউযবক (১২৫১ খ্রী.) লখনৌতির গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১২৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র নদীয়া জয় করেন এবং ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে "সুলতান মুঘিসউদ্‌দীন ইউযবক" উপাধি ধারণ করে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার স্মারক হিসেবে ৬৫৩ হিজরী/ ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মান্দারণ ও নদীয়ার রাজস্ব দ্বারা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন এবং স্বনামে খোৎবা পাঠ করেন।[২৪] মুদ্রায় তিনি নিজেকে "আল-সুলতান-উল-আজম-মুঘিস-উদ-দুনিয়া-ওয়াল-দীন-আবুল-মুজাফ্‌ফর-

ইউযবক-আল-সুলতান" রূপে ঘোষণা করেন। দুর্ভাগ্যবশত ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করায় তাঁর স্বাধীনতা মাত্র দুই বছর স্থায়ী হয়।[২৫]

সুলতান মুঘিসউদ্‌দীন ইউযবকের মৃত্যুর সাথে সাথে লখনৌতি পুনরায় দিল্লীর সুলতান নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইজ্জউদ্‌দীন বলবন-ই-ইউযবকী লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দু'বছর (১২৫৭-৫৯ খ্রী.) বাংলা শাসন করেন এবং দিল্লীর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশস্বরূপ দিল্লীর সুলতানের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করেন। ১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পূর্ব বাংলা আক্রমণের ব্যস্ততার সুযোগে কারা প্রদেশের গভর্নর মালিক তাজউদ্‌দীন আরসলান খান লখনৌতি আক্রমণ ও দখল করেন। তাজউদ্‌দীন আরসলান খান বিহার ও লখনৌতি (১২৫৯ খ্রী.-১২৬৫ খ্রী.) পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করেন এবং ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আরসলান খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তাতার খান ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর শাসনকাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। ইতোমধ্যে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ এর মৃত্যুর পর উলুখ খান বলবন 'সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন বলবন' উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে লখনৌতির শাসনকর্তা তুঘরল তুঘান খান 'সুলতান মুঘিসউদ্‌দীন' নাম ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২৬] সুলতান বলবন তুঘরলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু পর পর দুটি অভিযানে বলবন ব্যর্থ হন। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযানে তুঘরলকে পরাজিত ও নিহত করে পুত্র নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৭] লখনৌতি পুনরায় দিল্লীর অধীন প্রদেশে পরিণত হয়।

বুঘরা খান ১২৮১-৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর অধীন শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্‌দীন বলবনের (পিতার) মৃত্যুর পর 'নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ শাহ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে লখনৌতিতে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] বাংলার রাজনীতিতে তাঁর প্রধান অবদান হলো তিনি পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনউদ্‌দীন কায়কাউস ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় নয় বছর স্বাধীন সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৯] তাঁর সময় রাজ্যসীমা পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট, দক্ষিণে সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) এবং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[৩০] তাঁর মৃত্যুর পর শামস্‌উদ্‌দীন ফিরূয শাহ লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে তিনি রুকনউদ্‌দীন কায়কাউসের ভ্রাতা অর্থাৎ বলবনী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আবার অনেকের মতে, তিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন।[৩১] তিনি পূর্ববঙ্গ- সাতগাঁও, ময়মনসিংহ এবং সিলেট তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অর্থাৎ প্রায় সমগ্র বাংলা তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসে।[৩২] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্‌দীন বাহাদুর শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে সিংহাসন নিয়ে ভাতৃকলহ দেখা দেয়। এই সুযোগে দিল্লীর সুলতান

গিয়াসউদ্‌দীন তুঘলক ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্‌দীন বাহাদুরকে পরাজিত ও বন্দী করে বাংলাদেশে পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার শাসনকর্তাদের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাকে তিনি তিনটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন যা লক্ষণাবতী, সাতগাঁও, সোনারগাঁ নামে পরিচিত এবং প্রত্যেক ইউনিটে একজন করে প্রশাসক নিয়োগ করেন।[৩৩] নাসিরউদ্‌দীন ইব্রাহীমকে লখনৌতিতে এবং তাঁর পালক পুত্র বাহরাম খানকে সাতগাঁ ও সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[৩৪]

২. স্বাধীন সুলতানী আমল: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার সুযোগ পান। এসময় গিয়াসউদ্‌দীন বাহাদুর মুক্তি লাভ করেন এবং বাহরাম খানের সাথে যৌথভাবে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে গিয়াসউদ্‌দীন বাহাদুর স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাহরাম খান তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাম খান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বর্মরক্ষক ফখরা ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং ফখরউদ্‌দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪১ খ্রী.) উপাধি ধারণ করে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ফখরউদ্‌দীন মুবারক শাহ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাই বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূত্রপাত করে। এসময় বাংলার সীমানা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫] অপরদিকে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান নিহত হলে তাঁর সেনাধ্যক্ষ আলী মুবারক লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন এবং 'আলাউদ্‌দীন আলী শাহ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর ক্ষমতায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হাজী ইলিয়াস। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস আলাউদ্‌দীন আলী শাহকে হত্যা করে 'সুলতান শামস্‌উদ্‌দীন ইলিয়াস শাহ' উপাধি ধারণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং বাংলায় একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাতগাঁ অধিকার করেন এবং ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্‌দীন মুবারক শাহের উত্তরাধিকারী ও পুত্র ইখতিয়ারউদ্‌দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁ দখল করেন। এভাবে তিনি সমগ্র বাংলা একত্রিত করে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্' উপাধি ধারণ করেন।[৩৬] এছাড়া তিনি ত্রিহুত, উড়িষ্যা ও বিহারের কিছু এলাকা জয় করেন।[৩৭] তার ক্ষমতা লাভ বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কারণ ইতোপূর্বে ফখরউদ্‌দীন মুবারক শাহ এবং আলাউদ্‌দীন আলী শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও সমগ্র বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে ইলিয়াস শাহের ভূমিকা প্রশংসার্হ। তিনিই সর্বপ্রথম সোনারগাঁ, সাতগাঁ এবং লখনৌতিকে অর্থাৎ সমগ্র বাংলা একত্রিত করে স্বাধীন সুলতানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ যশ ও খ্যাতির সাথে বাংলা শাসন করে। এসময় থেকেই বাংলার মুসলিম রাজ্য বিদেশী শাসনের প্রকৃতি ত্যাগ করে দেশীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে এদেশীয় রাজ্যে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ ক্ষমতা লাভ করে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর রাজ্য শাসন করেন।[৩৮] স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক সিকান্দার শাহের রাজ্যসীমা

দেবকোট (দিনাজপুর), পাণ্ডুয়া (মালদহ) এবং মোল্লা সিমলা (হুগলী) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধারণা করা হয়।[৩৯] সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্‌দীন আযম শাহ ক্ষমতা লাভ করেন এবং ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১০-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।[৪০] তাঁর শাসনামল রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন না করলেও তিনি চরিত্রবান, বিদ্যোৎসাহী এবং সুশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।[৪১] তাঁর মৃত্যুর পর সাইফউদ্‌দীন হামজা শাহ ১৪১০-১১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪১১-১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুই বছর রাজ্য শাসন করেন এবং মুদ্রায় 'সুলতান-উস-সলাতীন বা রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।[৪২] কিন্তু তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। কারণ এসময় গণেশের চক্রান্তে ক্রীতদাস শিহাবউদ্‌দীন বায়জীদ শাহ তাকে হত্যা করে স্বয়ং ক্ষমতা দখল করে প্রায় তিন বছর রাজত্ব করেন।[৪৩] তাঁর মৃত্যুর পর আলাউদ্‌দীন ফিরূয শাহ সিংহাসনে বসেন এবং কয়েক মাস পরেই আলাউদ্‌দীন ফিরূয শাহকে হত্যা করে রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন।[৪৪]

রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভ করেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রসিদ্ধ সুফী নূর-কুতুব-উল-আলম বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিম সালতানাত আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ফলে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র এক বছর শাসন করার পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'জালালউদ্‌দীন মুহাম্মদ শাহ' উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[৪৫] তিনি ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর রাজত্ব করেন।[৪৬] তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজ্য বিস্তার এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন। তিনি উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, এবং ত্রিপুরা ও বিহারের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া আরাকান রাজ্যও তাঁর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪৭] এছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি পারস্য সম্রাট শাহরূখ এবং মিসরের সুলতান আশরাফ বারস্‌বারের সাথে দূত বিনিময়[৪৮] করে পরারাষ্ট্রনীতিতে দক্ষতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দান করেন।[৪৯] ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহমদ শাহ 'শামস্‌উদ্‌দীন আহমদ শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৩২/ ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪৩৫/ ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর রাজত্ব করেন।[৫০] এই স্বল্পকাল রাজত্বের পরে তিনি স্বীয় ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে গণেশের বংশের পতন হয়[৫১] এবং বাংলার রাজনীতিতে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫২]

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ। তিনি ইলিয়াস শাহের বংশধর হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" রূপে আখ্যায়িত করেছেন। নাসিরউদ্‌দীন মাহমুদ ১৪৩৫-৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর রাজত্ব করেন।[৫৩] তাঁর সময়ে বাংলার মুসলিম রাজ্য পশ্চিমে বিহারের ভাগলপুর, দক্ষিণে হুগলী জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিল।[৫৪] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রুকনউদ্‌দীন "বারবক শাহ" উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৫ বছর রাজত্ব করেন।[৫৫] তাঁর সময়ে মুসলিম রাজ্যের প্রভূত বিস্তার ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "শামস্‌-উদ-দীন আবুল মুজাফফর ইউসুফ শাহ" উপাধি ধারণ করে ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।[৫৬] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চাচা এবং রুকনউদ্‌দীন বারবক শাহের ভ্রাতা ফতেহ্‌ শাহ "জালালউদ্‌দীন আবুল মুজাফফর ফতেহ্‌ শাহ" উপাধি নিয়ে ক্ষমতা লাভ করেন এবং ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে হাবসী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেন এবং ফতেহ্‌ শাহকে হত্যা করে ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে হাবশী খোজা বারবক "সুলতান শাহজাদা" নাম ধারণ করে বাংলায় হাবশী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

হাবশী বংশের মোট চারজন সুলতান ৬ বছর বাংলা শাসন করেন। তারা ছিলেন ১. সুলতান শাহজাদা, ২. মালিক আন্দিল সুলতান সাইফউদ্‌দীন ফিরূয শাহ, ৩.কুতবউদ্‌দীন মাহমুদ শাহ, ৪.শামস্‌উদ্‌দীন মুজাফ্‌ফর শাহ। এদের মধ্যে সাইফউদ্‌দীন ফিরূয শাহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সমগ্র বাংলা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে জানা যায়।[৫৭] অতঃপর এই বংশের শেষ শাসক শামস্‌উদ্‌দীন মুজাফ্‌ফর শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অমাত্য এবং অভিজাতবর্গ তার বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাকে হত্যা করে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে হাবশী শাসনের অবসান ঘটায়।[৫৮]

১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে হাবশী সুলতান মুজাফ্‌ফর শাহ নিহত হওয়ার পর তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হুসাইন "আলাউদ্‌দীন হুসাইন শাহ" উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন[৫৯] এবং হুসাইন শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের 'স্বর্ণযুগ' নামে খ্যাত এসময় মোট ৪ জন শাসক ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪৫ বছর বাংলা শাসন করেন। এই বংশের সুলতানগণ যুদ্ধ কৌশল ও শাসনে সাধারণ প্রজার কল্যাণকামী ছিলেন। ফলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং বাঙালী বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়।

আলাউদ্‌দীন হুসাইন শাহ ক্ষমতা লাভ করেই চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলা বিহারের অধিকাংশ এবং উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, কামরূপ ও কামতা রাজ্যের কিয়দংশ জয় করেন।[৬০] হুসাইন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্‌দীন নুসরত শাহ ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিশাল রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখা ছাড়াও রাজ্যের পশ্চিম দিকে তাঁর সীমানা বর্ধিত করেন।[৬১] ১৩ বছর রাজত্ব করার পর ১৫৩১-৩২ খ্রিষ্টাব্দে নুসরত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্‌দীন ফিরূয শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু পিতৃব্য গিয়াসউদ্‌দীন মাহমুদের উচ্চাভিলাষের কারণে ক্ষমতা লাভের নয় মাস পরে গিয়াসউদ্‌দীন মাহমুদ কর্তৃক নিহত হন। ভ্রাতুস্পুত্র আলাউদ্‌দীন ফিরূয শাহকে হত্যা করে গিয়াসউদ্‌দীন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধের সুযোগে বিহারের আফগান শাসনকর্তা শেরশাহ

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্‌দীন মাহমুদকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলার সালতানাত দখল করেন।[৬২] গিয়াসউদ্‌দীন মাহমুদ দিল্লীর সুলতান হুমায়নের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু হুমায়নের গৌড় আক্রমণের পূর্বেই গিয়াসউদ্‌দীন মৃত্যুবরণ করেন। গিয়াসউদ্‌দীনের মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলায় হুসাইন শাহী বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বাংলার রাজনীতিতে নতুন ধারা সূচিত হয়।

৩. শুর ও কররানী আমল: ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ন গৌড় আক্রমণ করেন। শের খান গৌড় ছেড়ে রোটাস দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে হুমায়ন বিনা বাধায় গৌড় দখল করেন। গৌড়ের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তিনি কিছুদিন গৌড়ে অবস্থান করেন। কিন্তু দিল্লীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে হুমায়ন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লী অভিমুখে গৌড় ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে 'চৌসা' নামক স্থানে শের শাহ তাকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং গৌড় পুনরাধিকার করে "ফরিদউদ্‌দীন আবুল মুজাফ্‌ফর শের শাহ" উপাধি গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬৩]

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ কর্তৃক বাংলা দখলের সাথে সাথে বাংলার দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান হয় এবং বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছর বাংলা শুর ও কররানী কর্তৃক শাসিত হয়।[৬৪] ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ন পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে কণৌজের যুদ্ধে হুমায়ন পরাজিত হন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। ফলে বাংলা পুনরায় দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান শুর 'ইসলাম শাহ' নাম গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর রাজত্ব করেন। এসময়ও বাংলা দিল্লীর অধীন থাকে। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা শামস্‌উদ্‌দীন মুহাম্মদ শুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে "শামস্‌উদ্‌দীন মুহাম্মদ শাহ গাজী" উপাধি গ্রহণ করেন।[৬৫] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্‌দীন বাহাদুর শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই "গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ" উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দের কিছু অংশ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[৬৬] জালাল শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে গিয়াসউদ্‌দীন নামক এক ব্যক্তি সিংহাসনচ্যুত করে নিজে ক্ষমতায় আরোহণ করলে শুর শাসনের অবসান হয়।[৬৭] এই গিয়াসউদ্‌দীন এক বছর এগার দিন রাজত্ব করার পর ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানী তাকে হত্যা করে কররানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮]

১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেননি। মাত্র কয়েক মাস পরে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাই

সোলায়মান খান কররানী ক্ষমতা লাভ করেন। শিলালিপির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, তিনি চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলা ও বিহারের অধিশ্বর হন।[৬৯] তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় ও পাণ্ডুয়ার পরিবর্তে তান্ডায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।[৭০] ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজীদ কররানী ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সোলায়মান কররানীর ভাগিনেয় ও জামাতা হান্‌সু তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন।[৭১] কিন্তু সোলায়মান কররানীর উজীর লোদী খান হান্‌সুকে হত্যা করে সোলায়মান কররানীর কনিষ্ঠপুত্র দাউদ খান কররানীকে সিংহাসনে বসান। দাউদ খান পিতার মতো বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন না। ফলে আফগানদের মধ্যে প্রকৃতিগত আত্মকলহ পুনরায় দেখা দেয়।[৭২] এছাড়া সোলায়মান কররানী আকবরের প্রতি নমনীয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন। অপরপক্ষে তাঁর পুত্র দাউদ খান কররানী আকবরের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করেন। এতে আকবর তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বাংলা জয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।[৭৩] তাঁর মৃত্যুর ফলে স্বাধীন সালতানাতের অবসান হয় এবং বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়।

এভাবে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিজিত বাংলার মুঘল সম্রাট আকবরের মুঘল সাম্রাজ্যভূক্তকরণের মধ্য দিয়ে সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, নভেম্বর, ১৯৭৭) পৃ. ৭৪; মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৯৮), পৃ. ১৩৬।

২. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

৩. এ কে এম ইয়াকুব আলী, "বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ বিন্যাসের ধারা", *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা* ,প্রথম সংখ্যা ২০০০, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী , মার্চ ২০০০, পৃ. ২৬।

৪. ড. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

৫. *তদেব*।

৬. *তদেব*, পৃ. ৯২।

৭. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আ.কা. মো. যাকারিয়া (অনু. এবং সম্পা,) ঢাকা : বাংলা একাডেমী, *১৯৮৩)*, পৃ. ৫১।

৮. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৯১।

৯. *তদেব*, পৃ. ৯২।

১০. *তদেব*, পৃ. ৯৩।

১১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১২. *তদেব*, পৃ. ১৪৬-১৪৮।

১৩. কে. এম. রাইছউদ্‌দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা প্রাচীন, মধ্য, ও আধুনিক যুগ* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, নভেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২০৬।

১৪. *তদেব*।
১৫. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।
১৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।
১৭. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।
১৮. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
১৯. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।
২০. *তদেব*।
২১. *তদেব*, পৃ. ১১২।
২২. *তদেব*, পৃ. ১১৫। Shamsuddin Ahmed, *Inscription of Bengal,* Vol. IV (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), p. 7
২৩. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।
২৪. *তদেব*।
২৫. আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫৬।
২৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *মধ্যযুগ* (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭), পৃ. ১৫-১৯।
২৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।
২৮. আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।
২৯. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬-১৩৭।
৩০. Sir Jadunath Sarkar, *History of Bengal,* Vol. II (Dacca: University of Dacca, 2nd Impression, 1972), p. 74.
৩১. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১২৪।
৩২. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মার্চ , ১৯৮২), পৃ.২৯।
৩৩. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।
৩৪. Sir Jadunath Sarker, *op.cit.,* pp. 86-94.
৩৫. Shams-i-Siraj, *Tarikh-i-Firuj-shahi (*Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1890), p. 296; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৩।
৩৬. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮; ড. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
৩৭. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।
৩৮. কে. এম. রাইছউদ্‌দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০।
৩৯. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।
৪০. *তদেব*, পৃ. ২০০।
৪১. *তদেব*, পৃ. ২১০।
৪২. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতাদের আমল* (কলকাতা: ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬), পৃ. ৯৪।
৪৩. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২-১৯৩।
৪৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৯।
৪৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৫২।
৪৬. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১।